 ISSN 2789-1062

অমর ভাণ্ডারী*

'৭১-এর গণহত্যা, সংকট ও মুক্তিযুদ্ধ: পশ্চিমবঙ্গের নাটকে তার প্রতিচ্ছবি

[**সারাংশ:** এই প্রবন্ধে **১৯৭১** সালের বাংলাদেশের গণহত্যা, রাজনৈতিক সংকট ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতিচ্ছবি পশ্চিমবঙ্গের নাট্যচর্চায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনার শুরুতে **১৯৪৭** সালের দেশভাগ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য, ভাষাগত বিরোধ এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই দীর্ঘস্থায়ী শোষণ ও নিপীড়নের পরিণতিতে **১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা এবং পাকিস্তানি সামরিক বাহিনির গণহত্যা ও নির্যাতনের ভয়াবহতা আলোচিত হয়েছে। একই ভাষা ও সংস্কৃতির আত্মিক বন্ধনের কারণে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও নাট্যকর্মীরা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে গভীরভাবে সংহতি প্রকাশ করেন। তাঁরা সভা-সমাবেশ, সাহিত্য, সংগীত, যাত্রা ও নাটকের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের দুর্দশা, শরণার্থী সংকট এবং মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা তুলে ধরেন। এই প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকারদের নির্বাচিত নাটক বিশ্লেষণের মাধ্যমে **১৯৭১** সালের গণহত্যা, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনির নৃশংসতা, বাঙালির প্রতিরোধ, উদ্বাস্তু সংকট এবং স্বাধীনতার আকাঙ্খার বিভিন্ন দিক অনুসন্ধান করা হয়েছে।]

সূচকশব্দ : নাটক, মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা, জয় বাংলা, ইয়াহিয়া খান

ভারতের দীর্ঘ পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীনতা প্রাপ্তি ছিল দীর্ঘ সংগ্রাম ও উন্মুক্ত মনে নিজেদের মেলে ধরার অদম্য ইচ্ছার ফলশ্রুতি। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা এসেছে ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে এসেছে দেশের বিভাজন। যে বিভাজন কেবল ভূমির নয়, মানুষের মনেরও। শতাব্দী প্রাচীন 'বিবিধের মাঝে মিলন

*** অতিথি অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত***

মহান' বাণী তুলে ধরা দেশকেই দেখতে হল বিভাজনের রাজনীতি। যে বিভাজন হয়েছিল বৃহত্তর দুটি ধর্ম হিন্দু ও মুসলমান-এর স্বাধিকার রক্ষাকে কেন্দ্র করে। স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকার কাদের হাতে থাকবে, সেই দ্বন্দ্বের অন্তিম পরিণতি দেশভাগের (১৯৪৭) মাধ্যমে হয়। এই দেশভাগের ফলশ্রুতি ছিল ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের গঠন। খুব অদ্ভুতভাবে তৈরি হয়েছিল এই পাকিস্তান রাষ্ট্রটি–ভারতবর্ষের দুই প্রান্তের দুটি প্রদেশ, পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ এবং বাংলার পূর্বাংশ নিয়ে। ফলে পাকিস্তানের দুই প্রান্তের বাসিন্দাদের ধর্ম যদিও ছিল এক, কিন্তু তাদের ভাষা, জাতি, সংস্কৃতির মধ্যে ছিল ব্যবধান। ফলে নবগঠিত এই দেশের দুই উপকূলের মানুষের মানসিক দূরত্ব একে অপরের 'মনোভাব' বুঝতে অন্তরায় সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা লাভের পর যেখানে ভারতবর্ষ নিজেকে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-ভাষা-সংস্কৃতি নিরপেক্ষভাবে প্রতিষ্ঠা দিতে সচেষ্ট হয়েছে, সেখানে পাকিস্তান প্রথম থেকেই কট্টরতার পরিচয় রেখেছে। পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর চলেছে পশ্চিম-পাকিস্তানের অবদমন, শাসন ও শোষণ। সেজন্যই দেশভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পর থেকেই ভিন্ন সংস্কৃতির দুই জাতির মধ্যে লড়াই লক্ষ করার মতো। এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী জনগণের ওপর জোর-পূর্বক পশ্চিম-পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চাইলে সংঘটিত হয় রক্তক্ষয়ী ভাষা-আন্দোলন (১৯৫২)। এই অবদমন, শোষণ ও শাসন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছালে প্রয়োজন পড়ে পুনরায় দেশভাগের। এই ভাগের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ যে সশস্ত্র লড়াই করে তা ইতিহাসের পাতায় 'মুক্তিযুদ্ধ' (১৯৭১) নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে ভারত সরকার সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ধর্মের দিক থেকে এক হয়েও সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ এবং অর্থনৈতিক শোষণের দরুন এই বিভাজন হয়। আসলে ১৯৪৭-এর দেশভাগের অবশ্যম্ভাবী ফলই হচ্ছে ১৯৭১-এর পাকিস্তান-ভাগ এবং নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা।

বাংলাদেশের এই সংগ্রাম কেমন ছিল তা বিভিন্ন নাট্যকারদের রচিত নাটকে বিভিন্ন দিক দিয়ে ধরা পড়েছে। ওপার বাংলার মতো এপার বাংলার থিয়েটারেও কিছু নাটক পরিচালিত হয়েছে এবং সেসব নাটক লিখেছিলেন এপার বাংলার নাট্যকাররা। সেসব নাটকের আলোচনার মধ্য দিয়েই মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা অনুভব করা যেতে পারে। এপার বাংলার নাট্যকারদের মুক্তিসংগ্রাম নিয়ে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার পিছনে অবশ্য সবথেকে বেশি কাজ করেছিল বাঙালি 'মনোভাব'। ওপার বাংলায় বাংলা ভাষাভাষী যেসব জনগণ

বাস করত, ঘটনাস্রোতে তারা অন্যদেশের বাসিন্দা হলেও তাদের সঙ্গে এপার বাংলার যোগাযোগ ছিল আত্মিক। যে আত্মার মুল ছিল এক ভাষা ও একই সংস্কৃতি। ফলে তাদের ওপর যখন আঘাত আসে এবং রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার যখন পুনরায় ঘর ছাড়তে বাধ্য করে, রাতারাতি তারা উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই এপার বাংলার শিল্পী বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক নাট্যকর্মীরা চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। তাঁরা পথে নেমেছেন, সভা করেছেন, উপন্যাস, গল্প, কবিতা লিখেছেন, গান বেঁধেছেন, যাত্রা সভায় বাংলাদেশীদের সংগ্রাম প্রচার করেছেন, থিয়েটার মঞ্চে মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে নাটক প্রদর্শনও করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ নিয়ে ওপার বাংলার কিছু খ্যাতনামা নাট্যকার ও তাঁদের নাটক হলো–মমতাজ উদ্দিন আহমদের 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা', 'বকুলপুরের স্বাধীনতা', 'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম', 'কি চাহ শঙ্খচিল', 'বর্ণচোর', নীলিমা ইব্রাহিমের 'যে অরণ্যে আলো নেই', সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', জিয়া হায়দারের 'সাদা গোলাপে আগুন', আলাউদ্দিন আল আজাদের 'নিঃশব্দ যাত্রা', 'নরকে লাল গোলাপ' ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র যেহেতু এপার বাংলায় নাটক সেহেতু আমরা সেই সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকব।

ঠিকানা

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে উৎপল দত্ত 'ঠিকানা' ও 'জয় বাংলা' নাটক দুটি রচনা করেন। 'ঠিকানা' নাটকটি পিপলস্ লিটিল থিয়েটার কর্তৃক একাদেমি অফ ফাইন আর্টসের মঞ্চে ২ আগস্ট ১৯৭১ সালে প্রথম অভিনীত হয়। নাটকের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল এ নাটক 'বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মুক্তিসংগ্রামের কাহিনী।'[১] নাটকটি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন রচিত। বাংলাদেশের অধিবাসীদের যুদ্ধের সফলতা এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জন তখনও নিশ্চিত হয়নি। মুক্তিবাহিনির সংগ্রাম এবং ভারতে আশ্রয় নেওয়া বিপুল বাংলাদেশীর ভবিষ্যৎ পরিণতিতে রয়েছে ধোঁয়াশা। এরকম সময়ে তিনি এই নাটকে বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামকে কুর্নিশ ও সমর্থন করেছেন এবং পাকিস্তান সরকারের প্রতি তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন।

নাটকটির যাবতীয় ঘটনা ১৯৭১-এর ২২ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত মোট চারদিনের সময়কালে বিধৃত হয়েছে। শুরু হয়েছে একজন ঘোষকের ঘোষণা দিয়ে। যে ভাঙা ভাঙা বাংলা উচ্চারণে বলে 'হাপনারা ডরবেন নাই। ডরবার

কোনোয় কারণ নাই।...যো বদমাশরা য়হাঁ জয় বাংলা আওয়াজ উঠায়ে লড়াই কোরছিল উওলোগ সব খতম হো গয়ে।...শেখ মুজিবরের বদমাশরা ভাগ্ গেছে, পালায়ে গেছে। তাহারা সোব মরে গেছে।'[২] এখানেই 'জয় বাংলা', 'শেখ মুজিবুর' ইত্যাদি শব্দবন্ধ নাটকের দিক নির্দেশ করে দেয়। জানা যায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাও আতঙ্কগ্রস্থ।

নাটকের চরিত্র নানী ও মকবুলের কথোপকথনে উঠে আসে সর্বত্র পাকিস্তানি সেনার তাণ্ডব, অনেক সাদধারণ মানুষ দেশছাড়া, মুজিবুর রহমানের গ্রেপ্তার ইত্যাদি। এরকম পরিস্থিতিতে রশিদা নানীর দোকানকে পোস্টাপিসের মতো ব্যবহার করে মুক্তিযোদ্ধারা। সেখানে সতর্ক পদক্ষেপে মকবুল এসে রসিদা নানীকে খবর দেয়, নির্দিষ্ট এক ব্যক্তি নানীর দোকানে এসে তাকে একটি গোপন ঠিকানা বলে যাবে, যেটি তাকে মনে রাখতে হবে। সেই ঠিকানাই পাওয়া যাবে ডিনামাইট। পরে অন্য ব্যক্তি এসে সেই ঠিকানা গোপনেই জেনে যাবে। কারণ মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আক্রমণ করতে পাকিস্তানী সেনার জন্য রেলগাড়ি করে বারুদ আনা হয়েছে। সময় থাকতেই তার ধ্বংস প্রয়োজন। সেজন্যই প্রয়োজন ডিনামাইট। নানীর এই দোকানেই অন্যদিকে সাহাবুদ্দিন চৌধুরী, ডাক্তার আনিসুজ্জামান, যামিনী সেন ও হাশমৎ আলির মধ্যে যে কথোপকথন চলে তাতে উঠে আসে যুদ্ধময় পূর্ব-পাকিস্তানের পরিস্থিতির কথা। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে গুলি করে ছাত্রদের হত্যা করে, ছাত্রীদের ধর্ষণ করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে ট্যাঙ্ক চালায় সেই কথা নাটকে সাহাবুদ্দিনের সংলাপে উঠে আসে।

> 'দেখলাম খানসাহেবরা ছাত্রদের ওপর ট্যাঙ্ক চালাচ্ছে। কলেজটাকে তো কামান দেগে শুইয়ে দিয়েছে-বিভৎস।...কলেজের কম্পাউন্ডে অন্তত তিরিশটা লাশ গুনেছি-তার মধ্যে মেয়ের লাশ অন্তত দশটা...'।[৩]

প্রথম দৃশ্যেই নাটকের আর একটি দিক উপস্থিত হয়-যা এক ব্যর্থ কাপুরুষ প্রেমিকের আত্মহত্যাকে ঘিরে আবর্তিত। যে আত্মহত্যাকে খুন বলে প্রচার করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনি ছ'জন নির্দোষ বাংলাদেশ নিবাসী অর্থাৎ সাহাবুদ্দিন চৌধুরী, ডাক্তার আনিসুজ্জামান, যামিনী সেন, হাশমৎ আলি, রশিদা খাতুন ওরফে নানী ও হাসিবুনকে গ্রেপ্তার করে এবং পরবর্তীতে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শোনায়। আসলে এই আনুষঙ্গিক ঘটনাটি নাটকের গতি সঞ্চালনের জন্য নাট্যকার উপস্থাপিত করেছেন বলে মনে হয়। এর মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে

সক্ষম হয়েছেন পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তানি পাঞ্জাবি মুসলিমদের নির্যাতন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান বাহিনি নির্দোষ বাঙালিদের বিনা কারণে কেবল বাঙালি বলে হত্যা করেছে। সুতরাং ছয় বন্দিদেরও বুঝতে অসুবিধা হয় না তাদের পরিণতি কী হতে পারে। অথচ হাসমৎ, সাহাবুদ্দিন, যামিনী ও আনিসুজ্জামান পাকিস্তানের বিরোধী ছিল না, আওয়ামি লীগের কোনো সদস্যও তারা নন। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এই আশঙ্কা তাদের মধ্যে ছিলই, পরে নিশ্চিত হয়ে যায় পাক-বাহিনির কর্ণেল ওয়ালিউল্লার দপ্তর থেকে আনিসুজ্জামানের আনিত সংবাদে। আনিসুজ্জামান কর্ণেল ওয়ালিউল্লার সঙ্গে দেখা করার সুপারিশ করেছিল; অনুমতি পেলে দেখা করতে গিয়ে জানতে পারে ২৫ এপ্রিল রবিবার ভোর ছ'টায় ছয় বন্দিকে সামরিক আইনে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। একজন মদ্যপ মৃত পাক-সেনার মৃত্যুর জন্য ছয় জনকে মারাটা কী 'ইনসাফ'–আনিসুজ্জামান জানতে চায়লে ওয়ালিউল্লা বলতে দ্বিধা করে না, 'মৃত লেফ্‌টেনান্ট একজন পশ্চিম পাকিস্তানী; আপনারা বাঙালি মাত্র।'[৪]

আফজল বোখারি যে আত্মহত্যা করেছে সেটা পাকিস্তান বাহিনি ছাড়া আর জানত শাহেদা ওসমান। সুতরাং তাকে গ্রেপ্তার করতে না পারলে মুক্তিবাহিনিরও জানতে বাকি থাকবে না আসল ঘটনা। সেজন্য শাহেদা ওসমানকে গ্রেপ্তার করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে পাকসেনারা। এই অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধা মকবুল শাহেদাকে খুঁজে বার করে নিয়ে যায় গা ঢাকা দেওয়ার জন্য মাদার-ই-মিল্লাত হাইস্কুল ফর গার্লস-এ। স্কুলে পাকবাহিনির বর্বরতার চিহ্ন পরিদৃশ্যমান। স্কুলকে তারা ভেঙেছে, পুড়িয়েছে বাংলা বইপত্র। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও বই ছিল। বাঙালি সংস্কৃতির উপর আক্রমণ শানিয়েছে। বোখারির আত্মহত্যার কথা মকবুল জানতে পারে শাহেদার কাছ থেকে। সেটা দেশময় প্রচার করার সিদ্ধান্ত নেয় মকবুল। যাতে পাকিস্তান সেনার নৃশংসতার কথা শুনে বাংলাদেশ নিবাসীদের মনে পাকিস্তানের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা তৈরি করতে পারে। যারা যুদ্ধ থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল তাদের মনেও যেন জন্ম নেয় যুদ্ধের তাগিদ। শাহেদার সঙ্গে বোখারির পূর্ব পরিচয়ের কথা বলতে গিয়ে শাহেদা বলে ২৮ মার্চের কথা। যেদিন পাকবাহিনি আক্রমণ করেছিল কলেজ প্রাঙ্গনে ছাত্রছাত্রীদের ওপর। হত্যা করেছে পঞ্চাশ জন ছাত্রকে, ধর্ষণ করেছে ছাত্রীদের। তাদের মধ্যে ছিল শাহেদার প্রেমিক কায়ফি; যে কবিতা

আওড়ে যুদ্ধ থামাতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। শান্তির কোনো বাণীই তারা শোনেনি। সশস্ত্র যুদ্ধই একমাত্র পথ।

নাটকে গ্রেপ্তার হওয়া ছয় চরিত্র সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির অন্তর্গত। আনিসুজ্জামান পেশায় ডাক্তার, যামিনী নাট্যকার, হাসমৎ যামিনীর বন্ধু ও মধ্যবিত্ত সাধারণ ব্যক্তি। সাহাবুদ্দিন চৌধুরী সমাজের পুঁজিপতি ব্যবসায়ী। টাকার দম্ভ যার কথায় কথায় ধরা পড়ে। দিনমজুর নানী একসময় তার কারখানারই শ্রমিক ছিল এবং হাসিবুনের মা রাবেয়া সাহবুদ্দিনের কারখানাতে এক দুর্ঘটনায় মারা যায়। কারণ সাহাবুদ্দিন যন্ত্রের মেরামত করেনি। তাই নানী সাহাবুদ্দিনকে ধিক্কার দিয়েছে এই বলে,

> 'ঐ রাবেয়ার ঘাড়ে ধ্বসে পড়ে ক্রেন। কারণ আপনি যন্ত্র সারাননি। আপনার কাছে রাবেয়ার প্রাণের দাম ছিল মেশিন সারাবার চেয়েও কম।'[৫]

নাটকে প্রত্যেকটি চরিত্রের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করেছেন নাট্যকার। বিশেষ করে যামিনী, সাহাবুদ্দিন ও নানীর। প্রত্যেকের মানসিক দৃঢ়তা এবং মনের উদারতা ও সংকীর্ণতা তাদের শ্রেণির সঙ্গে যুক্ত। যেমন যামিনী যখন জানতে পারে তার স্ত্রী সেলিমা যে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায় সেই সন্তানটি আসলে ছিল তার বন্ধু হাশমতের, তখন তার কাছে পৃথিবীর সব কিছুই প্রতারণা বলে মনে হয়েছে। মনে হয়েছে সে জীবনে ব্যর্থ একজন ব্যক্তি। কিন্তু তার মধ্যে বীরোচিত (Heroic) ব্যাপার কাজ করত; আর সেটা তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে নাটকে বিভিন্ন নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে। সেজন্যই সে যখন দেখেছে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তখন পাক-অফিসার ওয়ালিউল্লাহর কাছে গিয়ে বোখারির মৃত্যুর দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিজের প্রাণের বিনিময়ে বাকি পাঁচ জনের প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছে। যাতে সে নায়কের সার্থকতা পেয়ে নিজের জীবনের গ্লানি মুছতে পারে। সাহাবুদ্দিন পুঁজিপতি ব্যবসায়ী। টাকা ও প্রতিষ্ঠার অহঙ্কার তার সর্বত্র। আনিসুজ্জামানের গবেষণা 'Notes on Death and Disintegration of Psychic Standards'-এ তার চরিত্র ব্যাখ্যা হয়েছে এভাবে- 'Extrovert, sublimating his fears...মৃত্যুর সম্ভাবনা পর্যন্ত অস্বীকার করেছে...মৃত্যুর কাছাকাছি এসে তার নৈতিক, মানসিক ও সামাজিক মান সম্পূর্ণ ধ্বসে গেছে।'[৬] উৎপল দত্তের 'বিপ্লবী থিয়েটার'-এ পুঁজিপতি শ্রেণির কলুষিত দিক বারবার উঠে এসেছে–যা শ্রেণিঘৃণা উদ্রেক করতে বিশেষ সহায়তা করে, দর্শকের চিনে নিতে সুবিধা হয় তাদের শত্রুকে। এ নাটকেও তার অন্যথা দেখি না। সাহাবুদ্দিন চৌধুরীদের কাছে দেশ,

জনগণ, সমাজ, পাপ-পূণ্য এসবের কিছু মূল্য নেই। তারা একমাত্র নিজেদের জন্যই বাঁচে আর নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। তাই সে বলে,

'হ্যাঁ, সেটা ছিল '৪৭ সালের জুন। মাউন্টব্যাটেন দিল্লীতে এসে গেছেন। লীগ আর কংগ্রেস নেতারা চুপি চুপি সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছেন। কিন্তু এই বাংলা দেশের মুসলমানদের কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছিল না। কিছুতেই তারা বাংলাদেশকে ভাগ করতে দেবে না।...আমি তো রাজনীতি করতাম না। পিছন থেকে টাকা যোগাতাম। তাই রূপচাঁদের জোরে...মুসলিম লীগের অধিবেশনে ঢুকে গেলাম। বললাম–

বৃটিশ সরকার তো কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে সুভাষ বোস আর বোম্বাইয়ের কমিউনিস্টরা।...বাংলাদেশ দু'-টুকরো হবে। এটা মেনে নিলে আপনারা হারাচ্ছেন কি? বাংলাদেশের ঐক্য ও সংহতি। সেটা তো চোখে দেখা যায় না। কিন্তু চট করে গদিতে বসে পড়তে না পারলে কমিউনিস্টরা জিতবে।...আমি হারাবো আমার পাট...আপনি হারাবেন জমিদারি...ইনি হারাবেন কারখানা।'[৭]

সে নিজের প্রাণ বাঁচাতে কর্ণেল ওয়ালিউল্লাকে অর্থের লোভ দেখিয়েছে। এমনকি যেখানে যামিনী বোখারির মৃত্যুর দায় নিজের ঘারে নিয়ে বাকি পাঁচজনকে বাঁচাতে চেয়েছে, সেখানে সাহাবুদ্দিন নানীর ঘারে সেই দোষ চাপিয়ে নিজে বাঁচতে চেয়েছে। তার জন্য শেষ পর্যন্ত সকলের কাছে সে ঘৃণার পাত্র হয়েছে।

রশিদা খাতুন ওরফে নানীকে নাটকের প্রধান চরিত্র বলা যেতে পারে। তার বুদ্ধিমত্তা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার ওপর মুক্তিযোদ্ধাদের অগাধ ভরসা। সেজন্যই তারা তাকে ও তার দোকানকে নিজেদের কাজের কেন্দ্র বানিয়েছিল। কোন ঠিকানায় ডিনামাইট পাওয়া যাবে তা কেবল জানত নানী; কিন্তু সে কারাবন্দি। তারপরেও তার ওপর মুক্তিযোদ্ধা মকবুলের ভরসা রেখেছে। সে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। বোখারির দেওয়া একটি চিঠি তার দোকানে থেকে গেছে–এই অজুহাত দিয়ে জেলের বাইরে বেরিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সেই ঠিকানা সে জানিয়ে দিয়ে গেছে। তার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় মেলে সপ্তম দৃশ্যে। যেখানে ওয়ালিউল্লা তার অভিসন্ধির কথা জানতে পেরে তার ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। জানতে চেয়েছে তার জেলের বাইরে যাওয়ার কী উদ্দেশ্য ছিল? তার গায়ে নাইট্রিক অ্যাসিড ঢেলে, জ্বলন্ত চুরুটের ছ্যাঁকা দিয়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা এবং আওয়ামীলিগের লোকজনের পরিচয়; কিন্তু সে

বলেনি। আনিসুজ্জামানের কথায়, 'বীর বলতে যা বোঝায়, হিরো বলতে ইতিহাসে যা বুঝিয়েছে, রশিদা খাতুন বোধহয় তাই। তাঁর নীরব বীরত্বের কাছে মৃত্যু পরাজিত।'[৮] নানীর চরিত্রের আর একটি দিক তার গল্প বলার অভ্যাস। নাটকের প্রথম দিকে সব অবান্তর কথা বলেও নাটকের শেষের দিকের গল্পগুলি পুঁজিবাদী, ফ্যাসিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মুখোশ খুলতে সাহায্য করে। তার কাজলবিবির গল্পতে ধরা পড়ে বাংলাদেশের সংগ্রামের ইতিহাস–

'আমার সই কাজলবিবির ছিল তিনটি ছেলে-রহমৎ, বরকৎ, শহাদৎ। তিনটের মধ্যে দুটো মরে গেল ভাষা আন্দোলনে। তখন কাজল বলল, ভাগ্যিস তিন ছেলের মা হয়েছিলাম, তাই একটা থেকে গেল। কিন্তু এই তৃতীয়টি শহাদৎ-সে গেল।'[৯]

নাটকের শেষ হয়েছে বন্দি পাঁচ জনের মৃত্যু দিয়ে। হাসিবুনের বয়েস অল্প বলে তাকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি। মৃত্যুকালে আনিসুজ্জামান কেবল নিজের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই মনে করেনি। বাকি চার জন বাংলাদেশের জয়ধ্বনি ও ভবিষ্যতের স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। আর নাটকের শেষ হয়েছে ডিনামাইটের বিস্ফোরণে বারুদের গাড়ির বিদ্ধস্ত হওয়ার আওয়াজে।

বাংলাদেশের জনগণের উপর পাকিস্তানের সেনাবাহিনি যে নির্মম বিচারহীন অত্যাচার চালিয়েছিল এই নাটকে তার কথা সংলাপায়িত হয়েছে। তার সঙ্গেই ধরা পড়েছে বাংলাদেশের মানুষের টিকে থাকার এবং নিজেদের মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার অদম্য ইচ্ছাশক্তি।

জয় বাংলা

'জয় বাংলা' নাটকটি রবীন্দ্র সদন মঞ্চে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে প্রথম অভিনীত হয়। আটটি দৃশ্যে বিভক্ত নাটকে যুদ্ধরত বাংলাদেশের যাবতীয় সংকট উঠে এসেছে। মৌলবী মোজাম্মেল হকের কন্যা নাজের সঙ্গে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক লেফটানেন্ট ওয়াহেদ আলির বিয়ের আশীর্বাদ অনুষ্ঠান দিয়ে নাটকের সূচনা। উৎপল দত্ত নাটকটিতে বাংলাদেশের দুটি সংকটকে তুলে ধরেছেন-একটি পাকিস্তান সেনা দ্বারা সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার, নারীদের সম্মানহানি, গণহত্যা, রাহাজানি ইত্যাদি; আর অন্যদিকে দবিরুল হোসেনের মতো মহাজনদের অত্যাচারে বড়মিয়ার মতো সাধারণ মানুষের

অসহায় অবস্থা। সেজন্যই নাটকে আমরা বাংলাদেশের জনগণকে এই দুপক্ষের সঙ্গেই প্রাণপণ লড়াই করতে দেখি। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই এই দুটি সংকটের কথা উঠে আসে। পাকিস্তান গঠনের পর থেকে পশ্চিম-পাকিস্তান পূর্ব-পাকিস্তান তথা বাংলাদেশকে নিজেদের উপনিবেশ ভেবেছে। সেখানে তারা উন্নয়নের বদলে শোষণ চালিয়ে নিজেদের পশ্চিম-পাকিস্তানকে উন্নত করেছে। বাংলাদেশ বা পূর্ব-পাকিস্তান ছিল তাদের কাছে খোলা বাজার এবং কাঁচামাল সংগ্রহের উপায় মাত্র। পশ্চিম-পাকিস্তান অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক সমস্ত দিক থেকে পূর্ব-পাকিস্তানকে অবদমিত করেছে। এছাড়াও আছে বাংলাদেশের জোতদার-মহাজনরা। যাদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ নাজেহাল। এ কথাই ব্যক্ত হয়েছে নাটকের প্রথম দৃশ্যে কবিয়াল খলিফের 'দুখের কথা বলব কত' গানে। এই মহাজনদের পরিচয় দবিরুল হোসেনের চরিত্রে মেলে। ভাষা আন্দোলনে লড়াই করার জন্য বড়মিয়ার জেল হলে সেই সুযোগে দবিরুল হাতিয়ে নেয় বড়মিয়ার সম্পত্তি। সেজন্যই মুক্তিযুদ্ধের সংকটময় পরিস্থিতিতে বড়মিয়া হাত গুটিয়ে চলে যায়।

নাটকটির পটভূমির সময়কাল বিচার করলে দেখি প্রথম দৃশ্যে মৌলভী বলেছে ঢাকায় ইয়াহিয়ার সঙ্গে মজিবুরের আলোচনা চলছে। অর্থাৎ পটভূমি সাধারণ নির্বাচন পরবর্তী, যখন ঢাকায় এসে ইয়াহিয়া খান দফায় দফায় মুজিবুরের সঙ্গে আলোচনা করে সেই সময় পর্বকে নির্দেশ করে। উৎপল দত্ত যে সময় নাটকটি রচনা করেছেন সেই সময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলছে, নির্বাচনে মুজিবুরের জয়ী হওয়া সত্ত্বেও তাকে পাকিস্তানের ক্ষমতা দিতে নারাজ ইয়াহিয়া। এমনকি তাকে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের খুব ভালো চোখে কোনদিনই দেখত না। ফিরোজ খান নুন ১৯৫২ সালে বলেছিলেন- এরা আধা-মুসলিম।[১০] বাঙালি মুসলিমরা তাদের কাছে ছিল ভীতু এবং অকেজো। সেজন্যই পশ্চিম পাকিস্তানি-নেতৃবৃন্দ নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় আইন সভায় বাঙালি সদস্য সংখ্যা কমাতে চেয়েছিলেন। প্রশাসনের উচ্চ পদে বাঙালির সংখ্যা ৩০ শতাংশের বেশি কোনো দিনও যায়নি। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সচিবের পদে মাত্র তিন জন বাঙালি পেয়েছিলেন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনিতে একজন মাত্র বাঙালি ল্যাফটেনান্ট জেনারেল ছিলেন।[১১] পাকিস্তান বাহিনিতে বাঙালি কখনও সমমর্যাদা পায়নি। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে বকসিং ম্যাচে নাট্যকার সে কথা ব্যক্ত করেছেন। পশ্চিম-পাকিস্তানি আলি ইয়ার খাঁ বারবার

নিয়ম ভাঙলেও তার কোনও ফাউল হয় না। উপরন্তু সঠিকভাবে ওয়াহেদ আলি ম্যাচ জিতলেও তাকে অযথা নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগে পরাজিত ঘোষণা করা হয় কেবলমাত্র বাঙালি হওয়ার কারণে। তার সঙ্গে আলি ইয়ার খাঁ হাত মেলাতে ঘৃণা বোধ করে। তাকে 'বাঙালি কুত্তা', 'আধা কাফের', 'বাঙালি গদ্দার' বলে অপমান করে। এছাড়াও তৃতীয় দৃশ্যে আলি ইয়ার খাঁ মৌলভী মোজাম্মেলকে সরাসরি বলে 'আপনি বাঙালি, মুসলমান নন' বা 'বাঙালি মুসলিমদের আমরা মুসলিম মনে করিনা' ইত্যাদি। এই বকসিং ম্যাচ চলাকালীন ব্রিগেডিয়ার ইফতিখার খাঁ ও লেফটেনান্ট করম দাদ-এর কথোপকথনে উঠে আসে-ঢাকার বুকে পাকিস্তানি সেনা তাণ্ডব করেছে, ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে ঢুকে ছাত্র-ছাত্রীদের হত্যা ও ধর্ষণ করেছে এবং মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা করছে পাকিস্তানের শাসক ইত্যাদি কথা। আর একটু পরেই মাইকে ঘোষণা হয়ে যায়-

> 'অ্যাটেনশন! অ্যাটেনশন অল অফিসার্স এন্ড মেন! ঢাকা থেকে হাই কমান্ডের অর্ডার-অপারেশন সুলতান! কলেজ হস্টেল আর পুলিশ ব্যারাক সাফ করুন। সব সন্দেহজনক বাঙালিকে শেষ করুন। অপারেশন সুলতান আরম্ভ করুন! পাকিস্তান জিন্দাবাদ!'[১২]

নয় মাসব্যাপী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনি দ্বারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নারীদের সম্মান। অন্তত দুই লক্ষ থেকে চার লক্ষ মতো নারী ধর্ষিত হয়েছিল নির্মমভাবে।[১৩] সুতরাং পাকিস্তান সেনা বাংলাদেশে যে নারী নির্যাতন করেছিল নাট্যকার সেই দৃশ্য রূপায়ন করবেন খুব স্বাভাবিকভাবেই। সেজন্যই তৃতীয় দৃশ্য দেখি এক মর্মান্তিক দৃশ্য; যেখানে নাজকে লাঞ্ছিত ও ধর্ষণ করে ক্যাপটেন আলি ইয়ার খাঁর। এই দৃশ্যে আরও দুটি বর্বর ঘটনার কথা আছে। একটি হল ফিরোজার স্বামী ও সন্তানকে বর্বরের মতো হত্যা করেছে পাকিস্তান সেনা। দ্বিতীয়ত মৌলভী মোজাম্মেলের বাড়িতে থাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই পুড়িয়ে ফেলেছে। কারণ তারা মনে করে 'বাঙালিদের বিদ্রোহে রবীন্দ্রনাথ একটা স্লোগান, একটা যুদ্ধের নিশান।'[১৪]

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে ও সমসময়ে বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল পাকিস্তানি শাসকের পরিপ্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক, সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শোষকের পরিপ্রেক্ষিতে আধা ঔপনিবেশিক এবং আভ্যন্তরীণ সামন্তবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আধা সামন্ততান্ত্রিক। এরকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে বিপ্লবের উত্থান ঘটেছিল তার চরিত্র ছিল দুটি–১.

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণ ও আধা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্তির প্রশ্নে এটি 'জাতীয় মুক্তি বিপ্লব' এবং ২. আভ্যন্তরীণ সামন্তবাদী শোষণ থেকে মুক্তির প্রশ্নে এটি 'গণতান্ত্রিক বিপ্লব'।[১৫] মুক্তিযুদ্ধের এই দ্বিতীয় দিকটিকে উৎপল দত্ত তাঁর এই নাটকে খুব স্পষ্টভাবে চিত্রিত করেছেন। প্রথম থেকেই দবিরুলের প্রতি বড়মিয়ার আক্রোশ সোচ্চারে ঘোষিত হয়েছে। নাটকের চতুর্থ দৃশ্যে এই বক্তব্য আরও প্রকাশ্য। বড়মিয়ার সঙ্গ নিয়ে দবিরুল যখন সপরিবারে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে খেয়ালির চরে আত্মগোপন করে তখন সে ট্রাঙ্কে বোঝাই করে তমসুক, জমির দলিল, মামলার কাগজ, ওকালতনামা সঙ্গে নিয়ে গেছিল। তার আশা ছিল পরিস্থিতি আবার সাধারণ হলে নিজের সমস্ত প্রতিপত্তির ওপর আবার রাজত্ব করবে। কিন্তু এখানে তার নিজের সন্তান ইকবালই বিরোধিতা করেছে। সে ট্রাঙ্ক বোঝাই কাগজ-পত্র জলে ফেলে দেয়। ইকবাল মুক্ত বাংলার আগামী দিনের সন্তান, তার মনে শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার বাসনা আছে। তাই সে দৃপ্ত কথায় নিজের বাবাকেও বলতে ছাড়ে না–

> 'জুলুমবাজি চালিয়েছ তোমরা। এইবার সব জুলুমের পালা শেষ করে দেয়ার লড়াই। পাঞ্জাবি মিলিটারি আর বাঙালি মহাজন-সবাইকে ঠেঙাবো।'[১৬]

নাট্যকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সেখানকার সাধারণ মানুষের সংগ্রামকে বীরগাথায় রূপায়িত করেছেন তাঁর নাটকে। এই যুদ্ধ যে কেবল রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, সংগঠন বা বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও বাঙালি পুলিশ দিয়ে জয় করা যাবে না তা বুঝতে কারও বাকি থাকে না। সেজন্যই ওয়াহেদ এসেছে গেরিলা যোদ্ধা বড়মিয়ার কাছে-যাতে সে যুদ্ধে যোগ দেয়। বড়মিয়ার সঙ্গে আছে হানিফ ও বদরের মতো সাধারণ কৃষক। বড়মিয়ার নির্দেশে সাধারণ মানুষ গেরিলা যুদ্ধ শুরু করলে মুক্তিফৌজের চাপ কমবে। এই প্রয়োজন অনুভব করে ওয়াহেদের মতো সৈন্যরা। এই মুক্তিসংগ্রামে বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা অংশগ্রহণ করেছিল। নাটকেও তার রূপায়ণ দেখি। বড়মিয়ার কিশোর সন্তান আব্বাস মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব। ধর্ষিতা নাজ নিজের শত্রুকে খতম করার কাজে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এরা অস্ত্র চালানো শিখে যুদ্ধে যোগদান করতে ইচ্ছুক। আবার অন্যদিকে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে জ্বলছে বিদ্রোহের আগুন, সমস্ত দিক থেকে তারা পাকিস্তান সেনাদের অসহযোগিতায় নেমেছে। একটা ঘরেও পাকিস্তানি সেনা এক গ্লাস জল পায় না, এমনকি পুকুরেও বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে। পাকিস্তান সেনার ব্রিগেডিয়ার ইফতিখার খাঁর মুখে শুনতে পায়–

> '...পুরো বাঙালি জাতি লড়ছে। সব রাস্তাঘাট কেটে উড়িয়েছে, রেললাইন উপড়ে নিয়েছে। যেখানে সেখানে গেরিলার বাচ্চারা হামলা চালিয়ে আমাদের মারছে।'[১৭]

উৎপল দত্ত তাঁর সমস্ত নাটকে ভণ্ড, ধর্মগুরু, পুঁজিপতি, জোতদার, জমিদারদের মুখোশ খুলেছেন। এই নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। পাকিস্তানি সেনাদের পাশবিক রূপ তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজের এই সব শোষকশ্রেণিরও স্বার্থপরতা দেখিয়েছেন স্পষ্টভাবে। নাটকের ষষ্ঠ দৃশ্যে আগমন ঘটেছে বাংলাদেশের এক মৌলানা চরিত্র হাকিমুদ্দির। সেও নিজের প্রাণ বাঁচাতে খেয়ালির চরে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে মৌলানা হয়েও বিলাসী জীবনযাপন করে, রাজনৈতিক দিক থেকে মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত থেকেছে, তিনবার মুনসিগঞ্জে দাঙ্গা লাগিয়েছে, গুন্ডা দিয়ে হিন্দুদের খুন করিয়েছে। আবার অন্যদিকে দবিরুল হোসেন ব্রিগেডিয়ার ইফতিকার খানের কাছে বড়মিয়ার বর্তমান ঠিকানা জানিয়ে দিয়েছে। সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বাঙালি জাতির কাছে। কিন্তু তার মাশুলও সে চুকিয়েছে। তার বিশ্বাসঘাতকতায় কেবল কেবল বড়মিয়া ও তার সন্তান আব্বাসই মারা যায়নি, সেই সঙ্গে কেড়ে নিয়েছে দবিরুলের সন্তান ইকবালকেও।

দুরন্ত পদ্মা

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন 'দুরন্ত পদ্মা' (১৯৭১)। পাকিস্তান বাহিনি কবলিত ও শৃঙ্খলিত মাতৃভূমিকে অতুলনীয় শৌর্য-বীর্যের সঙ্গে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করে বুকের রক্ত ঢেলে শৃঙ্খল মোচন করেছে যারা–সেই জীবনের আলেখ্য হয়ে উঠেছে নাটকটি। বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স নির্বিশেষে দেশের আপামর নাগরিক ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী লিখেছেন–

> 'বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাত্রলীগ, ছাত্র-ইউনিয়ন, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ ও আওয়ামীলীগ সহ অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনগুলি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত রাজনৈতিকভাবে সুশিক্ষিত প্রগতিশীল ছাত্র-সংগঠনগুলোর ভূমিকা স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছে। আপোস আলোচনার অজুহাতে ইয়াহিয়া যখন সময় কাটাচ্ছিলো, তখন বাংলার ঘরে ঘরে ব্যাপক অবিশ্বাস ও সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছিল। ছাত্র-শ্রমিক সংগঠনগুলো ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়েছিল, পশ্চিম-পাকিস্তানী কায়েমী

স্বার্থবাদী চক্র বাঙালীর ন্যায্য অধিকার আপোসে ছেড়ে দেবে না। কারণ এই কায়েমী স্বার্থবাদী সাম্রাজ্যবাদী চক্র যুগ যুগ ধরে বাঙালীকে শোষণ করে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বাঙালীর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে নিজের স্বার্থহানি ঘটাতে পারেনা তারা।'[১৮]

'দুরন্ত পদ্মা' নাটকে সেই দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। চরিত্র সঞ্চয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিচিত্র শ্রেণির নাগরিক স্থান পেয়েছে এখানে। মেজর খালেদ, ক্যাপ্টেন মাফুজ ও ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর হাবিলদার মান্নান–এরা মূলত কর্মের দিক থেকেই ছিল সৈন্য, যুদ্ধ-ব্যবসায় ছিল এদের একমাত্র কাজ। কিন্তু বাকি চরিত্রদের মধ্যে আছে ছোট ব্যাবসায়ী, শ্রমিক, চাষি, ছাত্র-ছাত্রী, ডাক্তার, ঘরের গৃহিণী ইত্যাদি সাধারণ নাগরিক। যেমন–ছাত্র লীগের মুক্তিযোদ্ধা রফিক, ছাত্র ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা অজিত, আওয়ামী লীগের যুবনেতা তাজিক আলি, বামপন্থী শ্রমিক নেতা জামাল উদ্দিন, সাধারণ শ্রমিক টিটু মিয়া, হিটলু মিয়া ও আজিজ, অবাঙালি বাংলাদেশ নিবাসী শ্রমিক মনু মিয়া, সাধারণ চাষি গেদু মিয়া, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ব্যাবসায়ী রহমান, চিকিৎসক ডা. সামসুদ্দিন, কিশোর বয়সী হাবিব এবং নারী চরিত্রগুলির মধ্যে আছে কলেজ ছাত্রী তথা মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু ও তার মা তথা রহমানের স্ত্রী হামিদা বিবি, হিন্দু নার্স বিনতা, ছেলে হারানো একমাত্র সম্বল নাতি হাবিবকে চেয়ে বেঁচে থাকা মুন্না বিবির মতো চরিত্র। মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী এরা সকলেই কোনও না কোনও ভূমিকা পালন করেছে। কেউ সরাসরি যুদ্ধে ভাগ নিয়েছে তো কেউ যোদ্ধাদের অন্যান্য প্রয়োজনে সাহায্য করেছে। মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকদের শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার এক সাহসী সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের নাটকীয় রূপ 'দুরন্ত পদ্মা'। সেজন্যই নাট্যকার এখানে এত বিচিত্র সব চরিত্রের সমাহার ঘটিয়েছেন। নাটকটির কাহিনি বিশ্লেষণ করে দেখে নিতে পারব মুক্তির আশায় সাধারণ জনগণের আপোসহীন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে।

মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যর কথা নাটকের প্রথম দৃশ্যেই প্রকাশ পেয়েছে, সেই সঙ্গে ধরা পরেছে বেশ কিছু সমস্যাও। যুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহ করা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম ও প্রধান কাজ। তাই লেফটানেন্ট মাফুজ, মান্নান, রফিক ও অজিতের শত্রু-শিবির থেকে অস্ত্র লুঠ করার পরিকল্পনা দিয়ে নাটকের শুরু। বিপরীত শক্তি পাকিস্তান সেনা অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। সেখানে বাংলাদেশের জনগণের কাছে তেমন পর্যাপ্ত

অস্ত্র না থাকায় মেজর খালেদ পরিকল্পনা করেন শত্রুর যাত্রা পথ নষ্ট করে তাদের অগ্রগতিতে বিলম্ব ঘটানোর। সেজন্যই রেলপথ, সেতু, সড়কপথ, বিমানবন্দর সমস্ত কিছুই নষ্ট করে দেওয়ার কথা বলে। এরকম পরিস্থিতিতে বামপন্থী শ্রমিক নেতা জামাল উদ্দিন এসে জানায়, পাটকলের শ্রমিকরা যুদ্ধে যোগ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু তারা চায় অস্ত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের কিছু নাগরিক এটাকে বাঙালিদের লড়াই ভেবে সেখানকার অবাঙালি বাসিন্দাদের প্রতি মারমুখী অবস্থান করে। কারণ তারা ভেবেছিল সমস্ত অবাঙালিই বাঙালির শত্রু ও পাকিস্তান সেনার সমর্থক। সেই দৃশ্য ধরা পড়ে মনু মিয়ার ওপর হিটলু, আজিজ, গেদুর চড়াও হওয়ার মধ্যে। শিরিন বানু এসে তার প্রাণ রক্ষা করে এবং জামাল উদ্দিন ও শিরিন বানু তাদের চিনিয়ে দেয়, আসল শত্রু পুঁজিপতি জমিদার ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি। কোনও অবাঙালি সাধারণ নাগরিক তাদের শত্রু নয়। বাংলাদেশের এই গণ-অভ্যুত্থানে ভারতের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছিল। সে দিকের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে মুকুলের সংলাপে

'...দেখলাম এপার বাংলা ওপার বাঙলা এক দিল্ হয়ে গেছে। গঙ্গা-পদ্মায় যে একই ধারা বয় তা নতুন করে দেখে এলাম শিরিন। শুধু পশ্চিম বাঙলাই নয়, সারা ভারত আজ আমাদের সঙ্গে।'[১৯]

প্রথম দৃশ্যে নাটকের যে অভিমুখ নির্দেশিত হয়েছে, পরবর্তী দৃশ্যগুলিতে কাহিনির আবর্তন ঘটেছে সেই পথ ধরেই। পূর্ব-পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার লড়াই যেমন নাট্যকার দেখিয়েছেন, তেমনি পাকিস্তান বাহিনির হানাদার রূপও দেখিয়েছেন। এখানে পাকিস্তান সেনাকে দেখানো হয়েছে লোলুপ, ধর্ষক, নৃশংস, লুঠেরা হিসেবে। দ্বিতীয় দৃশ্যে সেরকমই একটি চিত্র পাই। পাকিস্তান সেনা উজির খান ও বরকতুল্লা বাংলাদেশের লুঠ করা সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে কোন্দলে ব্যস্ত। এমন সময় পাকিস্তান সেনা ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ উজির খান ও বরকতুল্লা খানকে বাংলাদেশে এমন অত্যাচার চালাতে বলে যেন সেখানে 'কারবেলা'-র হাহাকার ওঠে। যাতে তাদের গণমুক্তির সংগ্রাম চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়। এখানে আমজাদ মিয়া নামে এক চরিত্রের আগমন ঘটিয়েছে। যে বাংলাদেশের একজন মহাজন ও জোতদার এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠির সমর্থক। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের যুদ্ধে এই আমজাদ মিয়ার মতো পুঁজিপতিরা নির্লজ্জের মতো পাকিস্তান সেনাবাহিনির সমর্থন করে গেছে। অথচ নাটকে দেখা যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনি তার প্রতি চাকরতুল্য ব্যবহার করে। নাট্যকার তাকে একটা

বিশ্বাসঘাতক চরিত্ররূপে তৈরি করেছেন। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান সেনার ছাউনি ঘিরে ফেললে সেই তাদের পথ চিনিয়ে সেখান থেকে বার করে।

চতুর্থ দৃশ্যে হামিদা বিবি ও রহমানের কথায় উঠে এসেছে কয়েকটি তথ্য। এই সময় যখন বাঙালিদের ওপর পাকিস্তান-বাহিনি অত্যাচার করছে তখন বেশি অত্যাচারিত হয়েছিল হিন্দু সম্প্রদায়। ফলে তাদের অনেকেই সেখান থেকে পালিয়ে ভারতে চলে আসে। হিন্দুদের অত্যাচারিত হওয়ার সেই কথায় শুনতে পায় তাদের সংলাপে। পাকিস্তান-বাহিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করলে সেখানে বহু ছাত্র-ছাত্রী মারা যায়। ছাত্রীদের হোস্টেল রোকেয়া হলে পাকিস্তান-বাহিনি গণধর্ষণ চালায়। ধর্ষণের হাত থেকে নিজেদের সম্মান বাঁচাতে প্রায় ৫০টি ছাত্রী হস্টেলের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে।[২০] সে কথাও শুনতে পায় হামিদার কণ্ঠে–

> 'লড়াই ইজ্জতের জন্য। শোননি, ঢাকায় ইজ্জত রক্ষার জন্য ছাত্রীরা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে জান্ দিয়েছে, তবু দুশমনের হাতে ধরা দেয়নি।'[২১]

বাংলাদেশের কিছু জোতদার শ্রেণির লোক ও তাদের অনুগামী গোষ্ঠী প্রথম থেকেই পাকিস্তান-বাহিনির সমর্থক ছিল। কাদের সিদ্দিকী জানান, তারা দালালদের মত কাজ করেছিল এই সময়। তাদের মধ্যে বেশ কিছুজন একত্রে শান্তিরক্ষা কমিটি গঠন করেছিল। কিন্তু সেই কমিটি শান্তি রক্ষার নামে সমস্ত রকম অশান্তি ছড়ায়। রাজাকার বানানো, ঘরবাড়ি জ্বালানো, লুটতরাজ, নারী অপহরণ, ধর্ষণ, খুন সবই তারা করে।[২২] এরা প্রথম থেকেই চেয়েছিল পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে। সেজন্য তারা সেখানে বসবাস করা হিন্দুদের বিতাড়িত করতেও পিছপা হয়নি।[২৩] চতুর্থ দৃশ্যে রহমানের সঙ্গে আমজাদ মিয়ার কথোপকথনে এরকম কথাই উঠে আসে। আমজাদ মিয়াও শান্তি রক্ষা কমিটি গঠনের কথা বলে এবং হিন্দুরা যাতে দেশ ছেড়ে চলে যায় সেই মতও ব্যক্ত করে।

পঞ্চম দৃশ্যে যুদ্ধে কার কী দায়িত্ব হবে তা নির্দিষ্ট করে মেজর খালেদ। মাফুজ, মান্নান ও ছাত্রযোদ্ধা রফিক, অজিতদের সঠিক পজিশন নিয়ে সঠিক সময় 'অ্যামবুশ' কায়দায় অর্থাৎ অতর্কিতে পাকিস্তান বাহিনির ওপর হামলা করার পরামর্শ তথা আদেশ দেয় মেজর খালেদ। এরকম হঠাৎ আক্রমণ পাকিস্তান বাহিনিকে দিশাহারা করে দেবে। আর শিরিন বানুর নেতৃত্বে গঠিত 'রোশেনারা বাহিনি'-কে শহরের রাস্তার মোড়ে, বাড়ির ছাদে ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন থাকতে বলে। যেন পাকিস্তানি সেনা তাড়া খেয়ে শহরে

প্রবেশ করতে গেলে তাদের হাতে আক্রান্ত হয়। এরকম পরিকল্পনা চলার সময় তাজিক ও জামাল এসে মেজর খালেদকে জানায়, কিছু লোক পশ্চিমা শ্রমিকদের উত্তেজিত করার জন্য উর্দুতে ইশতেহার ছাপিয়ে অবাঙালি বস্তিতে ছড়াচ্ছে এবং আওয়ামী লীগের সমর্থকদের বাড়ি চিহ্নিত করছে। মিত্র বেশী এই শত্রুদের খুঁজে বার করার দায়িত্ব তাজিক ও জামালদের উপরই ন্যস্ত করে মেজর খালেদ। সাধারণ নাগরিকদের হুশিয়ার করার দায়িত্ব পায় কিশোর বয়সী হাবিব। কথামতো সে কাজ করতে থাকলে আমজাদ মিয়া তাকে বাধা দেয়। এমন সময় সেখানে শিরিন ও মুকুল এসে পড়লে সে কুটিল কথার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে তাদেরই একজন বলে দাবি করে। কিন্তু এই সংকটের সময় শত্রু চিনতে বাংলাদেশের সাধারন মানুষ ভুল করেনি। ষষ্ঠ দৃশ্যে শিরিন, মুকুল ও আমজাদের কথোপকথনে সে কথায় উঠে এসেছে–

'শিরিন : কিছু পশ্চিমা দালাল দিয়ে আপনি এখানে দাঙ্গা বাঁধাবার তালে আছেন।

আমজাদ : ছিঃ ছিঃ ছিঃ! সব বানানো কথা। তুমি শিক্ষিতা মেয়ে। এসব বাজে কথায় তুমি কান দাও!

মুকুল : এখানে কিছু বাঙালি দালালও আপনার জুটেছে।

আমজাদ : এসব শয়তানদের রটনা, শয়তানদের রটনা। হারামীদের ধরতে পারলে কোতল করে ছাড়বো।

শিরিন : মনে রাখবেন রটনা যদি ঘটনা হয় তবে কোন জালেমই রেহাই পাবে না। ধর থেকে মুন্ডু খসে পড়বে।

...

মুকুল : আপনার গোলায় ধান পাওয়া যাবে?

আমজাদ : হে-হে-হে! এতে আবার কথা আছে নাকি? যখন খুশি... যখন খুশি। চাই কি এখনো নিয়ে যেতে পারে।

মুকুল : না, এখন প্রয়োজন নেই। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রয়োজন হলে নোব। কিন্তু আমরা নজর রাখবো কোনো জোতদার বা মহাজন গোলা থেকে ধান-চাল বাইরে সরায় কিনা।'[২৪]

পূর্বেই বলেছি নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধের দুটি উদ্দেশ্যের কথা ইঙ্গিত করেছেন–প্রথমটি হলো পাকিস্তানি হানাদারদের মুক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং শোষণমুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করা। দ্বিতীয়, সেজন্য বহিঃশত্রুর

সঙ্গে লড়াই একমাত্র কাম্য নয়, লড়াইয়ের অভিমুখ অন্তঃশত্রুর দিকেও। আমজাদ মিয়ার মতো জোতদার, মহাজনদের হাত থেকেও সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে হবে। ফলে নাটকে সাধারণ মানুষ একদিকে যেমন আক্রমণ করেছে পাকিস্তানি বাহিনিকে, তেমনি আর একদিকে তারা লড়াই চালিয়েছে জোতদারদের আমজাদ মিয়ার বিরুদ্ধে। নাটকের ষষ্ঠ দৃশ্যে এই আমজাদ মিয়ার অপকীর্তির কথা উঠে আসে। যেমন মুন্না বিবির একমাত্র সন্তান তথা হাবিবের বাবাকে জমির জন্য খুন করেছে। এই জোতদার শ্রেণির লোকেরা পাকিস্তানের হানাদার শক্তির দালালি করেছিল। নাটকেও দেখি আমজাদ মিয়া কখনও গোপন খবর দিয়ে, কখনও আঞ্চলিক ম্যাপ দিয়ে পাকিস্তান বাহিনিকে সাহায্য করে। ফলে দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত ক্ষোভে ও মুক্তিযুদ্ধে তাদের বিরূপ আচরণে অতিষ্ট হয়ে টিটু, হিটলু, গেদুর মতো সাধারণ শ্রমিক ও চাষিরা আমজাদ মিয়ার বাড়ি চড়াও হয়।

বাংলাদেশের যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা বারবার নাট্যকার তুলে ধরেছেন। অষ্টম দৃশ্যে দেখি ভারতের আকাশবাণী একমাত্র সংবাদ পাওয়ার মাধ্যম হয়েছে বাঙালিদের কাছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য লজেন্স ও বিস্কুট পাঠিয়েছে ভারত। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবে জাতি-ধর্ম নিরপেক্ষ আদর্শে সেকথাও ব্যক্ত হয়েছে। সেজন্য বিনতার মুখ থেকে হঠাৎ করে 'ভগবান' শব্দটি উচ্চারণে হলে সে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তখন তাকে রফিক অভয় দিয়ে বলে –

> 'রাবেয়া খাতুন নাম নিলেও আপনি যে হিন্দু মেয়ে, আমরা জানি। আপনি হিন্দু হয়েই এই বাংলাদেশে থাকবেন। আপনাকে আমরা শ্রদ্ধা করি।'[২৫]

শত্রুর জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় হঠাৎ আকাশে যুদ্ধবিমানের শব্দ শোনা যায়। ট্রাকে চেপে শত্রুরা তাদের দিকে এগোতে থাকলে ধৈর্যচ্যুত হয়ে পরিকল্পনা মাফিক সময়ের আগেই রফিক তাদের উদ্দেশ্যে গুলি চালায়। ফলে শত্রুরা সতর্ক হয়ে যায় এবং পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। পরবর্তী দৃশ্যে সেই নিয়ে মেজর খালেদ রুষ্ট হন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন রফিকের অনভিজ্ঞ পদক্ষেপের জন্য। সেজন্য রফিকের সঙ্গে মেজর খালেদের তর্কাতর্কি বাঁধে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, রফিকের মধ্যে ছাত্র সুলভ হঠকারিতা এবং সে যেহেতু বিজয়ী আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনের সদস্য সেহেতু তার মধ্যে বিজয়ের গর্ব, আত্ম-অহংকার ধরা পড়ে। তার বলতে বাধে না–

> '...আওয়ামী লীগ কারো হুকুম তামিল করে চলতে বাধ্য নয়। গোটা বাংলাদেশের জনমত তার পিছনে আছে।'[২৬]

দশম দৃশ্যে মেজর খালেদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সমস্ত খবর আদায় করতে পাকিস্তান বাহিনির গুপ্তচর মোবারক দরবেশ ছদ্মবেশে গ্রামে হাজির হয়। মুন্না বিবির কাছে সমস্ত খবর আদায় করে নিতেও সক্ষম হয়। কিন্তু শিরিন, রফিক, হাবিব সেখানে সঠিক সময়ে এসে তাকে বন্দি করে মেজর খালেদের শিবিরে বিচারের জন্য নিয়ে যায়। বাংলাদেশে এই সময় এক দল বাঙালি পাকিস্তানের শাসকদের দালালি করে গেছে। তারা কোনও মতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেনি। আমজাদের পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে, এই মোবারকও সেই রকম এক দালাল। সে বাঙালি হয়েও পাকিস্তান সেনার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করেছে। এরা পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্র বানানোর পক্ষে ছিল। তাই সে দর্পের সঙ্গে বলতে পারে–

> 'যারা পাকিস্তানের শত্রু তাদের খবর জোগাড় করা ইসলামের ফরমান। সেই ফরমান তামিল করতে গিয়ে যদি জান্ যায় তবে তা হবে কোরবানি।'[২৭]

নাটকের পরবর্তী ঘটনা নাটকীয়ভাবে এগিয়েছে। মোবারক পাকিস্তানি সেনাদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাকে উদ্ধার করার সঙ্কল্পে আমজাদ শিরিনকে অপহরণ করে ক্যাপ্টেন সাজ্জাদের হাতে তুলে দিয়েছে। সাজ্জাদ শিরিনকে বশে আনতে চাবুক মেরেছে, কিন্তু তার মাথা নোয়াতে পারেনি, তার লজ্জা হরণও করতে পারেনি। এখানে শিরিনের মধ্যে এক বীর মুক্তিযোদ্ধার দৃঢ়তা ধরা পরে। শেষপর্যন্ত রফিক, অজিত, মুকুল সহ মুক্তিবাহিনি শিরিনকে উদ্ধার করে এবং সেখানেই আমজাদকে হত্যা করে। নাটকের অগ্রগতিতে দেখা যায় পাকিস্তানি সেনারা সমস্ত শক্তি নিয়ে মুক্তিকামী বাংলাদেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, মানবতার সমস্ত সীমা তারা লঙ্ঘন করে, হাসপাতালেও বোমা মারতে তারা পিছপা হয়না। শহর অঞ্চল ক্রমশ তাদের দখলে চলে আসে। এরই মধ্যে অপরদিকে গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষ সংগঠিত হতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা শহর ছেড়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে, গেরিলা পদ্ধতিতে সেখান থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আঁটে।

এই যুদ্ধে বহু মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ও আহত হয়। নাটকেও দেখি গেদুর গুলি লেগেছে, হিটলু গুরুতরভাবে আহত, সামসুদ্দিনের হাসপাতাল ধ্বংস হয়ে গেছে, হাবিব নিজের চোখ হারিয়েছে, বিনতাও শহিদ হয়েছে। চারিদিকেই কেবল হাহাকারের ধ্বনি, আর ধ্বংসের চিহ্ন। এসবের মাঝে জামাল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীন সরকার গঠিত হওয়ার খবর নিয়ে আসে। সে বলে–

'পলাশীর অম্রকাননে যে স্বাধীনতা সূর্য একদিন অস্ত গিয়েছিল, মুজিবনগরের অম্রকাননে বাঙলাদেশের সেই স্বাধীনতা সূর্যের আবার উদয়।'[২৮]

দূর্বার বাংলা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন চলছে সেই সময় অনিল দে লিখেছেন 'দূর্বার বাংলা' একাঙ্কটি। 'অভিনয়' পত্রিকায় **১৯৭১** সালে এপ্রিল- মে সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। নাটকের পটভূমি ও বিষয় সম্পর্কে নাট্যকার স্পষ্ট জানিয়েছেন-

'এ নাটকের পটভূমি বাংলা দেশের একটি গ্রাম। বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ এখন তার মধ্যগগণে। কোনো দেশের যুদ্ধ যখন সেই দেশের মানুষের প্রাণের তাগিদ হয়, তখন তাকে আমরা বলি মুক্তিযুদ্ধ। বাংলা দেশের যুদ্ধ সেই সংগ্রাম, যে সংগ্রামে গোটা একটা জাত মুক্তির পথ খুঁজছে। লড়াই শুরু হয়েছে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে। লড়ছে সবাই। কেউ সামনে, কেউ পেছনে। এ নাটকে পেছনে যারা লড়ছে, তাদের লড়াইকে তুলে ধরা হয়েছে।'[২৯]

দুই মুক্তিযোদ্ধা সাহাবুদ্দিন ও সোরাবুদ্দিনের গৃহের মধ্যেই নাটকের ঘটনা-সংঘাত এগিয়েছে। এখানেই বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের আদান-প্রদানের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন কথা উঠে এসেছে। বর্তমানে দুই ভাই মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত, বাড়িতে তাদের বৃদ্ধা মা একাই থাকে। ঘরের চেহারা এক দরিদ্র চাষির ঘরের অনুরূপ।

নাটকের কাহিনির পরিধি থেকেছে এক রাত্রি। নেপথ্য আবহে মুহুর্মুহু শোনা যায় বোমারু বিমানের গর্জন, বোমার বিস্ফোরণ, আর্ত চিৎকার এবং মিলিটারি বুটের ভারী শব্দ। চারিদিকে সন্দেহের বাতাবরণ। তাই প্রথম থেকেই সাহাবুদ্দিন ও সোরাবুদ্দিনের মাকে দেখা যায় যখনই তার বাড়িতে কেউ দরজা ঠুকেছে তখনই সে একটি বঁটি উঁচিয়ে দরজা খুলেছে। এমনকি নয়-দশ বছর বয়সি ইশাক ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ইশাকদের সঙ্গে মায়ের কথোপকথনে ধরা পড়ে পাকিস্তান সেনার অত্যাচারের এক নির্মম চিত্র। ইশাকদের বাড়িতে পাকিস্তান সেনা এসে তোলপার করে, তার বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে, দুজন পাঞ্জাবী সেনা তার মা গর্ভবতী জেনেও তাকে ধর্ষণ করেছে–এই নির্মম অত্যাচারের জন্য তার গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে। এই

ধরণের অত্যাচার বাংলাদেশের শিশু মনেও ক্রোধ জাগিয়ে তোলে, যা ইশাকের কথাতেই স্পষ্ট–

'দাদী, মুজীব চাচা আমারে তার দলে নিতি পারে না? আম্মো তাইলে যুদ্ধু করতাম। বাবারে ছাড়ায় নে আসতাম। আমার ছোট্ট ভাইডারে যারা মারিছে তাগের কবর দেতাম।'[৩০]

নাটকের আরেকটি চরিত্র আফতাব অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত হয়নি, কিন্তু সশস্ত্র যোদ্ধাদের বাইরে থেকে সাহায্য করেছে-যুদ্ধের পরিস্থিতিতে এলাকাবাসীদের সচেতন করেছে, আওয়ামী লীগের বিভিন্ন বার্তা সকল বাসিন্দাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে, পাকিস্তানি সেনাদের বিভিন্ন খবর মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগের অফিসে নিয়ে গেছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবারের বন্দোবস্ত করেছে।

কাহিনির অগ্রগতিতে দেখা যায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনির দুজন সেনা দেবতোষ ও মইজুদ্দিন ছদ্মনামে সাহাবুদ্দিন ও সোরাবুদ্দিনের মায়ের কাছে এসেছে। আসলে তারা পাকিস্তানি সেনার গুপ্তচর। এসেছে আওয়ামী লীগের গুপ্ত অফিস ও বেতারকেন্দ্রের সন্ধান জানতে। এখানে মায়ের চরিত্রে গ্রাম্য সরলতা এবং মাতৃত্বের মহানুভবতা ধরা পড়ে। গুপ্তচর দুজন মায়ের কাছে তাদের অসহায়তার কথা বলেছে এবং নিজেদের পাকিস্তানি বাহিনির বিদ্রোহী সৈনিক হসেবে পরিচয় দিয়েছে। মা সেই কথাতেই বিশ্বাস করে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করছে, রাত্রে খাবার দিয়েছে। এর মধ্যে তারা বিভিন্ন অছিলায় আওয়ামী লীগের গোপন ঘাঁটির সন্ধান জেনে নেওয়ারও চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য মায়ের কাছে সেই সন্ধান ছিল না। এমন সময় সেখানে আফতাব এবং পরে ইশাক এসে উপস্থিত হয়। সে তাদের সন্দেহের চোখে দেখে। তারা আফতাবকে কথার ছলে ভোলাতে পারে না, যেমন করে মাকে ভুলিয়েছিল। ইশাক প্রথম দেখাতেই তাদের চিনতে পারে যে, এই দুজন সেনাই তার মাকে ধর্ষণ করেছিল। ইশাক সেখান থেকে বেড়িয়ে গিয়ে সোরাবুদ্দিনের কাছে সেই খবর দেয়। এদিকে আফতাবের কাছে কোনও খবর না পেয়ে সেনা দুজন আফতাবকে মায়ের অপরাধী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে এই বলে যে, আফতাব তার সন্তানদের পাকিস্তান সেনাদের কাছে ধরিয়ে দিয়েছে; মাও নিজের সন্তানের বিপদের কথা শুনে আফতাবকে অবিশ্বাস করেছে। ঠিক এরকম পরিস্থিতিতে সোরাবুদ্দিন, ইশাক সহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সশস্ত্র অবস্থায় সেখানে উপস্থিত

হয়। শেষপর্যন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইশাক দেবতোষের বন্দুকের গুলিতে নিহত হয় এবং সেই প্রতিশোধে মা বঁটি দিয়ে দেবতোষকে কুপিয়ে খুন করে।

মুক্তির রাইফেল

বেরটোল্ট ব্রেখট স্পেনের গৃহযুদ্ধের (১৯৩৬-১৯৩৯) পটভূমিকায় রচনা করেছিলেন 'সেনোরা কারারের রাইফেল' (১৯৩৭) নাটকটি, সেই নাটকের অবলম্বনে স্বপন কুমার মিত্র পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ তথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচনা করলেন 'মুক্তির রাইফেল' একাঙ্কটি। শুরুতে নাট্যকার ব্রেখটের একটি উক্তি দিয়ে নাটকটির রাজনৈতিক দিক ব্যক্ত করেছেন-

> 'সুন্দর সুন্দর কথার মালা গাঁথতে পারলেই শিল্প হবে এমন কোন মানে নেই। শিল্প মানুষকে নাড়া দেবে কি করে যদি মানুষের ভাগ্য শিল্পকে নাড়া না দেয়?'[৩১]

নাটকের কাহিনি বাংলাদেশের এক খেটে খাওয়া পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে মুক্তিযুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করেছে। সেই মুক্তিযুদ্ধের একটি রাতেই কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। রোশনারা বিবি তার দুই ছেলে হাসান ও হাবিবরকে চোখের আড়াল হতে দেয় না, যুদ্ধ থেকে তাদের বিরত রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু হাসান ও হাবিবরের মধ্যে আছে যুদ্ধের প্রতি আকর্ষণ ও উত্তেজনা। যেখানে গোটা একটি জাতি শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার তাগিদে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে সেখানে তারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছুক নয়। তাবলে এই নয় যে রোশনারা ভীতু বা স্বার্থপর। রোশনারার স্বামী তথা হাসান ও হাবিবরের বাবা মুক্তিযুদ্ধে যখন সামিল হয়েছিল তখন রোশনারা হাসিমুখেই বিদায় জানিয়েছিল। কিন্তু সেই যুদ্ধে সে শহিদ হলে রোশনারা নিজেকে ও তার দুই ছেলেকে যুদ্ধ থেকে দূরে ও নিরপেক্ষ রাখার চেষ্টা করেছে। এখানে আসলে তার মাতৃ মনের স্বাভাবিক দুর্বলতা কাজ করেছে, তারাই তার বেঁচে থাকার একমাত্র আশ্রয়, সে আর তাদের হারাতে চায় না।

ঘটনার অগ্রগতিতে ওসমান ও অজয় রোশনারার বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। উভয়েই মুক্তিযোদ্ধা, ওসমান রোশনারার ভাই তথা হাসান ও হাবিবের মামা এবং অজয় তাদের প্রতিবেশি। হাসান ও হাবিবের বাবার দুটো রাইফেল নেওয়ার উদ্দেশ্যেই তাদের আগমণ। কিন্তু রোশনারা সেই রাইফেল তাদের

হাতে তুলে দিতে চায় না, কারণ এগুলিই তার স্বামীর শেষ স্মৃতি। তাদের পারস্পরিক কথোপকথনে প্রকাশ পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় দিক। যেমন যুদ্ধের লক্ষ্য সম্বন্ধে অজয় রোশনারাকে বলেছে-

> 'নারে চাচী, রাজা জমিদার আমরা কেউ হব না সত্য, তবে রাজা-জমিদার, ধনী-দরিদ্র বলেও কেউ থাকবে না। তুই আমি প্রতিটি মানুষ বাঁচাব সমান অধিকার নিয়ে। প্রত্যেকে হব আমরা শোষণমুক্ত। তার জন্যেই তো আমাদের এই লড়াই রে চাচী।'[৩২]

নাটকে খাদেম মিঞা নামে একজন বাংলাদেশের জমিদারের কথা উঠে এসেছে-যে পাকিস্তানের হয়ে দালালি করেছে, মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের এরকম বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিদের কথা আগেই আলোচনা করেছি, যারা পাকিস্তানি শাসকের দালালি করে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষদের শোষণ করে নিজেদের আখের গুছিয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনির সঙ্গে লড়াই করার সঙ্গে সঙ্গে এদের বিরুদ্ধের সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। এই নাটকেও দেখা যায় এই খাদের মিঞা রোশনারাকে প্রাভাবিত করতে চায়। তার কাছে সে প্রচার করে যে, এটা আসলে হিন্দুদের ষড়যন্ত্র, তারা মুসলমান মেরে হিন্দুরাজ কায়েম করতে চায়।

নাট্যকার তাঁর রচনায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি চিত্র তুলে ধরেছেন অজয় ও রোশনারার মধ্যে। বর্তমানে তাদের মধ্যে ধর্মের বিভাজন মিটে গেছে, ব্রাহ্মণ সন্তান অজয় ভোজন করতে চেয়েছে রোশনারার মতো এক নিম্নবর্গের মুসলমানের ঘরে। এই ঘটনাই নাটকটিকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অজয়ের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য হাসান ও হাবিবকে রোশনারা বাইরের ক্ষেত থেকে কিছু সবজি তুলে আনতে বলে, তারাও তাই করতে বাড়ির বাইরে যায়। ঘটনাচক্রে কিছুক্ষণের মধ্যে পাকিস্তানি সেনা অতর্কিতে গ্রামে হানা দেয়, চারিদিকে ভীষণ অত্যাচার, লুটতরাজ চালাতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতেই শেষপর্যন্ত পাকিস্তানি সেনার গুলিতে হাসানের মৃত্যু ঘটে। রোশনারা নিজেকে ও তার দুই সন্তানকে যুদ্ধ থেকে নিরপেক্ষ ও দূরে রেখেও রেহাই পাইনি। বিপ্লবের সময় নিরপেক্ষ যে থাকা যায় না–এই সত্য সে বুঝতা পারে। তাই শেষপর্যন্ত সে তুলে নিয়েছে ঘরে লুকান তার স্বামীর রাইফেল দুটি, এই রাইফেলই হয়ে উঠেছে মুক্তির রাইফেল।

বাঁচার শপথ

মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত পানু পালের 'বাঁচার শপথ' একাঙ্কটির মধ্যে উঠে এসেছে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বাঙালিদের সমানুভূতি। নাটকটির কাহিনি মুক্তিযুদ্ধের একদম শুরুর দিকের। যখন পাকিস্তানি সেনা বাংলাদেশের সর্বত্র হত্যালীলা বাঁধিয়েছে এবং তার প্রতিবাদে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যুদ্ধ করছে। তবে এই যুদ্ধ আধুনিক অস্ত্রের সঙ্গে মানুষের আবেগের। যেই আবেগে জড়িয়ে আছে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্খা।

মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় ছেলে বিদ্যুৎ ও ছেলের স্ত্রী দ্যূতিকে নিয়ে কলকাতায় থাকে। প্রত্যেকেরই জন্মস্থান পূর্ববঙ্গে, বর্তমানে তারা বাস করে কলকাতায়। সেই সূত্রেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাদের বিচলিত করেছে। নাটকের কাহিনি শুরু এখান থেকেই। বিদ্যুৎ ও দ্যূতি দুজনেই রেডিওতে বাংলাদেশের সংবাদ শোনার জন্য উদগ্রীব, কিন্তু রেডিওতে ঢাকা স্টেশন আর ধরে না। নাটকের কাহিনি শুরু হয়েছে ২৫ মার্চ থেকে, যেদিন ইয়াহিয়ার ও ভুট্টোর সঙ্গে মুজিবুরের বৈঠক শেষ হয় এবং ইয়াহিয়া ও ভুট্টো দুজনেই পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। তারা আশা করেছিল এই বৈঠকে পশ্চিম-পাকিস্তান পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিদের সব দাবি মেনে নিয়ে তাদের স্বায়েত্বশাসন দেবে। কিন্তু পরক্ষণেই মোহিতবাবু একটি টেলিগ্রাম এনে বিদ্যুতের হাতে দেয়, যা পড়ে তারা জানতে পারে পশ্চিম-পাকিস্তান পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিদের কোনও দাবিই মানিনি, বরং সামরিক শক্তির প্রয়োগ করে সেই দাবি পদদলিত করতে চেয়েছে, অপরদিকে মুজিবুরও বাংলাদেশবাসীদের প্রতি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পাঁচদিন ধরে চলছে, বর্তমানে কোন স্থিতির মধ্যে আছে তার কোনও খবর তারা পাচ্ছে না। অথচ রেডিওতে পাকিস্তানের কেন্দ্র ধরছে, সেখানকার সমস্ত সংবাদে মুজিবুর ও তাঁর অনুগামীদের পাকিস্তানের শত্রু ও বিশ্বাসঘাতক বলে দাগানো হচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনা বিদ্যুৎকে উত্তেজিত করে তোলে। এমন সময় ঘরে উপস্থিত হয় অমিত ও সামসুল হক। প্রথমজন পশ্চিমবঙ্গের একজন সাংবাদিক, যে বাংলাদেশের সংবাদ সংগ্রহে গিয়েছিল এবং দ্বিতীয়জন এক মুক্তিযোদ্ধা। এই সামসুল হকের কথাতেই উঠে আসে বর্তমানে বাংলাদেশের যুদ্ধময় পরিস্থিতির কথা। পাকিস্তানি হানাদার সেনারা ঢুকে পড়েছে বাংলাদেশের সর্বত্র। ট্যাঙ্ক, বিমান সহ আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকসেনা চারিদিকে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ

জনগণ তাতে ভীত হয়ে আত্মসমর্পণ করেনি, বরং তারা রুখে দাঁড়িয়েছে, জীবনকে বাজি রেখে নিজেদের স্বাধিকারকে বুঝে নিতে চেয়েছে। তারা গেরিলাযুদ্ধের পদ্ধতি অনুসরণ করেছে, রাস্তা, রেললাইন সহ যাবতীয় যোগাযোগ মাধ্যমকে অকেজো করে নিজেদের সংগ্রাম চালিয়েছে। সামসুল এখানে বাংলাদেশে নিজেদের অঞ্চলের এক খণ্ড মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে। যেখানে ধরা পড়েছে সাদেক আলী ও তার স্ত্রী আফরোজার নেতৃত্বে সকল গ্রামবাসীর লড়াই ও প্রাথমিক সাফল্য, আফরোজা ও সুফিয়ার আত্মত্যাগ। সুফিয়াকে এখানে বীরাঙ্গনা করে দেখানো হয়েছে। পাকসেনা যখন ট্যাঙ্ক নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করে তখন এই সুফিয়া মাইন বোমা বুকে নিয়ে ট্যাঙ্কের তলায় শুয়ে পড়ে, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ট্যাঙ্ক ধ্বংসের সঙ্গে সুফিয়া শহিদ হয়। সুফিয়ার মৃত্যুর খবর দ্যূতিকে আহত করে, কারণ এই সুফিয়া ছিল তার বালিকা বয়েসের বান্ধবী। দ্যূতি আশা করেছিল স্বাধীন বাংলাদেশে গিয়ে আবার সুফিয়ার সঙ্গে দেখা করবে।

এছাড়াও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পানু পালের 'বিদ্রোহী বাংলা', বাসুদেব বসুর 'আমার সোনার বাংলা', বিজন ভট্টাচার্যের 'সোনার বাংলা' নাটকের নাম পাওয়া যায়; কিন্তু সেগুলি বর্তমানে দুস্প্রাপ্য।

রাজনৈতিক নাটকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিক কণ্ঠস্বর। পৃথিবীর কোনো মানুষ বা মানবগোষ্ঠী যদি অন্য কোনও শক্তি দ্বারা নির্যাতিত হয়, তাহলে রাজনৈতিক নাট্যকর্মীরা সর্বদাই নির্যাতিতের পাশে দাঁড়ায়। বাংলা নাট্য-ইতিহাসে এর একাধিক নিদর্শন রয়েছে। সেই ইতিহাসের একটি অধ্যায় হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা নাটকগুলি। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকাররা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বাংলাদেশের জনসাধারণের সংকটকে নিজেদের নাটকে তুলে ধরেছেন। পরতে পরতে উন্মোচন করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব এবং পাকিস্তানি সেনার নৃশংসতা। এখানে যে নাটকগুলি আলোচিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে বাংলাদেশের দুটি সংকট ধরা পড়েছে–একটি এসেছে পাকিস্তানি শাসক ও সেনাদের দিক থেকে এবং অপর সংকটটি অভ্যন্তরীণ। এটি এসেছে বাংলাদেশ নিবাসী পুঁজিপতি, জমিদার, জোতদার, মহাজনদের কাছ থেকে। এই দ্বিতীয় সংকটটি নাটকগুলিতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সেই সূত্রেই আনিসুজ্জামান, দবিরুল, আমজাদ ইত্যাদি চরিত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। আসলে এই দিকটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার পিছনে কাজ করেছিল সমসাময়িক পরিস্থিতি। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে সেই সময় কমিউনিস্ট

আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল। শ্রেণিশত্রুদের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার বাসনা সকলের চিন্তা জগতকে ত্বরান্বিত করছিল। সেজনই বাংলাদেশে যখন মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হলেঅ, বাংলাদেশীরা যখন নিজেদের জন্য পূর্ণ-স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল, তখন এপার বাংলার নাট্যকাররা সেই দেশকে সকল শত্রুর করাল গ্রাস থেকে মুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন। ফলে তাঁদের নাটকগুলিতে মুক্তিবাহিনিকে এই দ্বিবিধ শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করিয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১. দত্ত, উৎপল; *নাটক সমগ্র*, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২২, পৃ-৬০১
২. দত্ত, উৎপল; *ঠিকানা*, নাটক সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২২, পৃ.৩
৩. *ঐ*, পৃ-৬
৪. *ঐ*, পৃ-২২
৫. *ঐ*, পৃ-৭০
৬. *ঐ*, পৃ-৬০
৭. *ঐ*, পৃ-৪৪
৮. *ঐ*, পৃ-৬০
৯. *ঐ*, পৃ-৫৮
১০. সরকার, অভীক (সম্পাদনা), *বাংলা নামে দেশ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭২, পৃ-১২
১১. মাসকারেনহাস, অ্যান্থনী; *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ*, (অনুবাদ-রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী), ঢাকা, জুলাই ২০১০, পৃ-৩৫
১২. দত্ত, উৎপল; *জয় বাংলা*, নাটক সমগ্র, অষ্টম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪২১, পৃ-৯১
১৩. Shalarch, Lisa; *Rape as Genocide: Bangladesh, the Former Yugoslavia, and Rwanda*, New Political Science, 2000, P-94

https://doi.org/10.1080/713687893

১৪. দত্ত, উৎপল; *জয় বাংলা*, নাটক সমগ্র, অষ্টম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৯
১৫. হাসান, শফিকুল; *মুক্তির সংগ্রাম পূর্ব বাংলা*, রঞ্জন প্রকাশনী, কলকাতা, কার্তিক ১৩৭৮, পৃ-৬৭
১৬. দত্ত, উৎপল; *জয় বাংলা*, নাটক সমগ্র, অষ্টম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ-১০৯
১৭. *ঐ*, পৃ-১১৭
১৮. সিদ্দিকী, কাদের; *স্বাধীনতা '৭১*, বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, জুন ১৯৯২, পৃ-১০
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র; *দুরন্ত পদ্মা*, নির্মল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ-১১
২০. সরকার, অভীক (সম্পা.); *বাংলা নামে দেশ*, আনন্দ, এপ্রিল ১৯৭২, কলকাতা, পৃ-৩৮
২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র; *দুরন্ত পদ্মা*, প্রাগুক্ত, পৃ-৩১
২২. সিদ্দিকী, কাদের; *স্বাধীনতা '৭১*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৮৬
২৩.*ঐ*, পৃ-৫৯০-৫৯১
২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র; *দুরন্ত পদ্মা*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৪
২৫.*ঐ*, পৃ-৮০
২৬.*ঐ*, পৃ-৮৬
২৭. *ঐ*, পৃ-১০২
২৮.*ঐ*, পৃ-১৭০
২৯. দে, অনিল; *দূর্বার বাংলা*, দিলিপ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *অভিনয়*, দ্বিতীয় বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, এপ্রিল-মে ১৯৭১, পৃ-২৩৭
৩০.*ঐ*, পৃ-২৩৯
৩১. মিত্র, স্বপন কুমার; *মুক্তির রাইফেল*, সুনীল দত্ত (সম্পা.), *একালের একাংক*, চতুর্থ খণ্ড, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ-১১৫
৩২.*ঐ*, পৃ-১২৩